East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

বণিক বার্তা, ১৭-০৮-২০২২, পৃষ্ঠা- ০৪

গবেষণা পর্যবেক্ষণ

সেলিম রশিদ ● সৈয়দ আবুল বাশার
জোবাইদা বেহতারিন ● মোহাম্মদ রিয়াদ উদ্দিন

মহামারীসৃষ্ট সুযোগ আমরা কি সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি

ধরা যাক, আমাদের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ কোনো না কোনোভাবে করোনাভাইরাস প্রতিরোধী। এটা কি বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সোনার খনি ছিল না? এতে শুধু কৃষি উৎপাদন ও কলকারখানায় প্রতিদিন উৎপাদন অব্যাহত থাকত তা নয়, বিদেশী নিয়োগকর্তারাও বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগে অনেক বেশি আগ্রহী হতো। সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, এমনকি চীন পর্যন্ত হাজারে হাজারে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগে প্রণোদিত হতো। কর্মী নিয়োগে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে (যেমন কর্মীরা নিজস্ব বিচ্ছিন্ন আবাসিক এলাকায় বসবাস করা) উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং অর্থনীতিকে বাঁচানো স্বভাবতই তাদের স্বার্থে ছিল। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য এটা হতো অপূর্ব সুযোগ। কী চমৎকার সোনার খনি! এটা কীভাবে হাতছাড়া হলো?

শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর কভিডের প্রভাবটা চিন্তা করুন। চূড়ান্ত পরিসংখ্যানগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য। আগের ধারাবাহিকতা ও ধরন বজায় থাকলে ২০২০ সালে আমাদের অর্থনীতিতে ২৭ দশমিক ৫৩ ট্রিলিয়ন টাকা যোগ হতো, কিন্তু হয়েছে ২৬ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন টাকা। টাকার হিসাবে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ দশমিক শূন্য ৩ ট্রিলিয়ন টাকা কিংবা ১ হাজার ৩০ বিলিয়ন টাকা। পরবর্তী আঠারো মাসের কিছু বেশি সময়ে বাড়তি ক্ষতি খুব কম অনুমান করি। ধরা যাক, সেটি ২৫০ বিলিয়ন টাকা। সব মিলিয়ে আমরা মোট ক্ষতি পাই ১ হাজার ২৮০ বিলিয়ন টাকা। ৫ শতাংশের একটি কভিড কর ৬৪ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকার রাজস্ব সৃষ্টি করত। এ অর্থ থেকে প্রতি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ কোটি টাকা (এর মধ্যে অবকাঠামোর জন্য ৫ কোটি এবং পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকা) দিয়ে নতুন ৪৯৫ সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কিংবা প্রতি উপজেলায় অন্তত একটি নতুন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গড়ে তোলা যেত। তার পরও ১ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা থেকে যায়, যা দিয়ে শহরে আরো সরকারি স্বাস্থ্য ইউনিট গড়ে তোলা যেত, যেখানে স্টেডিয়াম কিংবা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠকে মহামারীর সময় জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য রূপান্তর করা যেত। এ ধরনের উদ্যোগে পুরো দেশজুড়ে দীর্ঘমেয়াদি মহামারী প্রস্তুতির সক্ষমতা তৈরি হতো এবং শহরগুলোর জন্য জরুরি পরিকল্পনা শুরু হতো। প্রতিটি সংকটই নতুন সুযোগ তৈরি করে, সে সুযোগ কি কাজে লাগানো গেছে? বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের কী করা উচিত ছিল তা মূল্যায়ন করার এটিই বোধ হয় সময়।

'ধরা যাক, বাংলাদেশের শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী কোনো না কোনোভাবে কভিড মহামারী প্রতিরোধী'—এটিই ছিল আমাদের শক্তিশালী প্রাথমিক ভিত্তি। এ ধরনের জোরালো দাবির পক্ষে অবশ্য কিছু একটা তথ্যগত প্রেক্ষাপট প্রয়োজন। তার জন্য কভিড মহামারীকালীন ঈদ উদযাপনের সময় বস্তি এলাকায় আমরা জরিপ চালিয়েছিলাম। যেহেতু ঈদের সময়ে শারীরিক দূরত্ব মেনে চলা অসম্ভব সেজন্য আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঈদের আগে ও পরে জরিপটা চালিয়েছিলাম এবং যতটা সম্ভব কভিডের সর্বোচ্চ প্রভাব কেমন তা তুলে আনার চেষ্টা করেছিলাম।

অতিমারীর শুরু থেকে ওমিক্রন ধরন পর্যন্ত পুরো সময়টায় ঢাকার তিনটি বস্তিতে আমরা চারবার জরিপ চালিয়েছি। ধরে নিই যে আমাদের বস্তিবাসীরা তাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সম্পর্কে প্রাথমিক লব্ধ জ্ঞান পোষণ করে, তাই জরিপকালে আমরা দশটি সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো করেছি। আমাদের সমীক্ষায় তাই প্রত্যক্ষভাবে বস্তিতে বসবাসকারী ২৫৫টি পরিবার এবং পরোক্ষভাবে আড়াই হাজার পরিবারের সম্ভাব্য প্রভাব উঠে এসেছে। আমাদের জরিপে কভিড-১৯-এ আক্রান্তের কেবল ১৭ জন সিভিয়ার রোগী পেয়েছি। কাজেই আমাদের দাবি হলো, বস্তিবাসী জনগোষ্ঠী বাস্তবে অনেকটাই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধী ছিল।

যদি কভিড বিপর্যয়কর বা মারাত্মক না হয়, তাহলে সংক্রামক হওয়াটা শুধু একটি জনস্বাস্থ্য ইস্যু, কোনোভাবে জাতীয় জরুরি অবস্থা নয়। ঢাকার বস্তি এলাকার মতো ঘনবসতি কভিড ছড়ানোর সম্ভাব্য উৎস হলে তাহলে কেন বস্তিগুলোয় মারাত্মক আক্রান্তের সংখ্যা এত কম? অতিমারীর শুরুতে ন্যাচার জার্নালে একটা কথা বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশে ৬৩ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট জিন আছে, যেখানে ইউরোপীয়দের তা ১০ শতাংশেরও কম। কভিড মোকাবেলায় এ জিনগত বৈশিষ্ট্য যদি আসলে সম্পদ হয় তাহলে কী হতো? তাহলে বাংলাদেশে কি ভাইরাসটির মিউটেশন হয়েছে? ভিন্ন ধরনের ভাঁদুড়ের কারণে বাংলাদেশী কভিড কি ভিন্ন? কভিডে প্রতিরোধ্যতা পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে নাকি দারিদ্র্য, শ্রম প্রভৃতি জীবনযাপন পরিস্থিতির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে? গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া কি কভিড মোকাবেলায় সাহায্য করেছে? কিংবা সর্দি-কাশি, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ইত্যাদি কি ক্রস ইমিউনিটি তৈরি

সেলিম রশিদ

সৈয়দ আবুল বাশার

জোবাইদা বেহতারিন

মো. রিয়াদ উদ্দিন

করেছে? এ ধরনের প্রশ্ন সামনে এসেছে।

এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সেই পার্থক্যগুলো আমাদের সন্ধান করা দরকার। বাংলাদেশীদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কি খাদ্য অর্থাৎ অ্যালকোহলের অভাব এবং মাংস খাওয়ার দ্বারা বৃদ্ধি পায়? নাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কারণে, যেমন অনুশীলনকারী মুসলমানরা দিনে পাঁচবার অজু করে? হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরামর্শ থাকতে পারে। প্রত্যাশিত সাড়ার যোগাযোগটা কি ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে ভালো এবং কার্যকর হয়েছে? পাবলিক পলিসি মানুষের কাছে পরিচিত এর মাত্রার ওপর দৃষ্টির মাধ্যমে। এই তাৎক্ষণিক ইস্যুগুলো যে ধরনের ধারাবাহিকতা/অধ্যবসায় দাবি করে সেই গুরুত্ব অনুযায়ী এবং জোরের সঙ্গে কি প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা হয়েছে কিংবা খতিয়ে দেখা হয়েছে?

আমাদের এ প্রশ্নগুলো ২০২০ সালের মার্চে করা যেতে পারত। তখন মৃত্যুহার হিসাব করা হয়েছিল প্রায় ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এটা ছিল জরুরি অবস্থা, জাতীয় সংকেতের কোনো কারণ নয়। তারপর আমরা জেনেছি যে 'এ নতুন ভাইরাস তাপ প্রতিরোধী এবং কেবল ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (৭৯-৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) মারা যাবে। এটি সূর্যকে ঘৃণা করে।' এ সংশয়ের মধ্যে একটা ভালো কারণ ছিল যে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা নিয়মিতভাবে দুপুরের প্রখর সূর্যতাপে কাজ করে তারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হবে না। এসব প্রশ্নের ব্যাপারেই বুদ্ধিজীবীদের বেশি কৌতূহলী থাকা এবং তোলা উচিত ছিল। অবশ্যই এটা সম্ভব যে বিদ্যমান অবস্থা যথাযথভাবে নির্ণয় করা হয়নি। তবে এসব অবস্থার কোনোটিই জনস্বাস্থ্যের ইস্যুটি পরিবর্তন করে না, যা ছিল আমাদের প্রাথমিক উদ্বেগের বিষয়।

যদি বাংলাদেশের শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী সত্যিই কিছুটা রোগ প্রতিরোধক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে জিজ্ঞাসা করতে হয় কেন এ প্রশ্ন সক্রিয়ভাবে আরো বেশি খতিয়ে দেখা হয়নি। আমরা আমাদের ফলাফল সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশ, বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নেটওয়ার্ক, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার গবেষকদের লেখনীর মাধ্যমে এবং আমাদের নিজেদের যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করেছি। আমরা হয়তো ভুলও হতে পারি, কিন্তু এটা অবশ্যই সত্যের ওপর ভিত্তি করে একটি অনুমান এবং যার গুরুত্ব জরুরি বিবেচনার দাবি করে। আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উত্থাপিত বৃত্তর প্রশ্নটির ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের সাধারণ উদাসীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের মধ্যে খুব স্থির অথচ আত্মনিশ্চিত কিছু বিষয় আছে। মহামারী সম্পর্কে আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির এ সীমাবদ্ধতাগুলোর জন্যই সমালোচনামূলক পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য খুব সহজেই বর্ণনা করা যায়। তাত্ত্বিকভাবে যে কেউ জানতে চাইবে যে কারা আক্রান্ত হয়েছিল, কীভাবে তারা সংক্রমিত হয়েছিল, কীভাবে তারা অন্যদের মাঝে ভাইরাস ছড়িয়েছে, মানবদেহের সব অংশে এর প্রভাব কী, সেগুলোর কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আছে কিনা, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কেমন ইত্যাদি। মৌলিক কারণগুলো খুঁজে বের করাই তাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল কাজ। বাস্তবে প্রশ্নটি খুব সাধারণ। তা হলো কভিড-১৯-এর প্রভাব কী? যদি সর্দি বা সাধারণ কাশি, যা প্রতি বছরই বাংলাদেশী মানুষ ভোগে, এমন লক্ষণের মধ্যে সীমিত থাকে তাহলে সব ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই কভিড-১৯ একটা ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা। এটি যদি ঠাণ্ডা না হয়, তাহলে আর কোনটা ঠাণ্ডা? সেগুলো কি আসলে পার্থক্য করা যায়? সেগুলো কি আলাদা করা যায়? এসব প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে যারা এরই মধ্যে ঝুঁকিতে আছে এবং সামনে ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে তাদের পার্থক্য করতে পারার উপায় খুঁজে বের করার ওপর ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়/সরকারি নীতি প্রণীত হতে পারে। এর জন্য গভীরতর জীববিদ্যা, সংক্রমণের ভাইরাসবিদ্যা কিংবা তৎপরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বোঝার দরকার নেই। এ মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার না হওয়ার ব্যর্থতা কভিড-১৯-এর সঙ্গে যুক্ত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় পদ্ধতিকে ঘিরে রেখেছে।

মহামারীর সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সময় আমাদের চিকিৎসকদের আচরণের দিকে তাকালে সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিদীপ্ত, বাস্তবসম্মত ও সহযোগিতামূলক পন্থা খুঁজে পাই। কোনো কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছাড়াই তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং কোনো ওষুধ ভালো কাজ করতে পারে সেই সম্পর্কিত তথ্য এবং সেবাযত্নের সর্বোত্তম চর্চাগুলো বিনিময় করেছিলেন। এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিনিময় তাদের জন্য জরুরি ছিল। অবশ্যই তারা ভুল করে থাকতে পারে এবং কিছুটা সম্ভবত করেছেও। কিন্তু এ শুদ্ধতাবাদী সমালোচনা একটা পয়েন্ট মিস করে। সেটি হলো একটি মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে এমনকি নিষ্ক্রিয়তাও একটা অ্যাকশন। সংকটের মুখোমুখি হয়ে এবং কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই চিকিৎসকরা এমন এক প্রশংসনীয় অ্যাপ্রোচ নিয়েছে যা তাদের কাজকে পরিচালিত করেছে। যে বাস্তবতার মধ্যে পড়েছে সেটিই তাদের আচরণ ও কাজকে পরিচালিত করেছে। এই ব্যাপক প্রশংসনীয় পদ্ধতিটি আমরা যারা আইভরি টাওয়ার থেকে বিশ্বকে দেখেছি তার মতো নয়। যারা সমস্যা সমাধান করে এবং যারা তা নিয়ে চিন্তা করে তাদের মধ্যে এ ধরনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন কেন?

এ মানসিকতাকে সম্ভবত আমরা বুদ্ধিবৃদ্ধিক ঔপনিবেশিকতা বলে বর্ণনা করতে পারি। ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি কিংবা অন্য খ্যাতিজোড়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যা কিছু বলেছিল, তা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। বাস্তবিকভাবে এ অ্যাপ্রোচ আমাদের ধারণা দেয় যে প্রকৃত দৈনন্দিন জীবন ও কাজের দিক থেকে সব মানুষের জীবতাত্ত্বিক অবস্থা অভিন্ন। অন্যথায় কেউ জানে না, ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা কেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে একই আকারে ও তীব্রতায় প্রযোজ্য হবে। বাস্তব উদ্দেশ্যের দিক থেকে সার্বিক সমরূপতা নয়, বাস্তবিক পার্থক্যই মাঠ পর্যায়ে কাজ পরিচালনা করতে পারে। এমনকি অনেক চিকিৎসা হস্তক্ষেপের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত আইসিডিডিআরবি এক্ষেত্রে কোনো আগ্রহ বা কর্মকাণ্ড দেখায়নি। কাজেই যে কেউ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নীরবতা সহজেই বুঝতে পারবে।

আমাদের বিষয়বস্তুর মূলে যেসব তথ্য লুকিয়ে আছে তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে দেখতে হবে। বিভিন্ন লেখাজোখায় প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, টিকা-বহির্ভূত ওষুধের কার্যকারিতা, কভিড-১৯-এ সংবেদনশীলতায় ভিন্নতা, কভিডের সঙ্গে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর অন্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যের আন্তঃসম্পর্কের উদাহরণ দেয়া হয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। এ ঔপনিবেশিক মানসিকতা মানব শরীরকে এতটা জটিল হিসেবে ভাবতে অনিচ্ছুক যে একটা অর্গানিজমের কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৈচিত্র্য বড় ধরনের ফলাফল না-ও দিতে পারে।

যদি জনগোষ্ঠীর কেবল ৪ শতাংশ আক্রান্ত হয়, তাহলে এটি সত্যিই এক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ৪ শতাংশের কারণে ৯৬ শতাংশ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ নিশ্চল বা বিপদগ্রস্ত করার মতো দেশ আমাদের নয়। ভাগ্যক্রমে সরকার এটা উপলব্ধি করেছে এবং মহামারীর মধ্যেও পোশাক শিল্প চালু রাখার অনুমতি দেয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে সরকার সিডিসি ও ডব্লিউএইচওর সঙ্গে মৌখিকভাবে অনুগত ছিল কিন্তু কার্যত বাস্তববাদী কাজ করেছে।

পুনশ্চ : আমরা টিকা উন্নয়নে তড়িঘড়ি করলেও ভাইরাস আমাদের টিকার মিউটেশন তৈরিতে আরো ব্যস্ত। কে জয়ী হবে, কেউ জানে না। মহামারী আমাদের অতীত থেকে মূলবান জ্ঞান ও চর্চা আহরণের দায়িত্ব আরোপ করেছে, যাতে ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারি।

সেলিম রশিদ : অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং ইমেরিটাস অধ্যাপক, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ আবুল বাশার : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
জোবাইদা বেহতারিন : শিক্ষার্থী, ক্যালগেরি ইউনিভার্সিটি
মোহাম্মাদ রিয়াদ উদ্দিন : গবেষণা সহযোগী, ইফপ্রি